অন্বীক্ষা

আন্তর্জালিক পত্রিকা

২০২২-২০২৩

মুর্শিদাবাদ : ফিরে দেখা

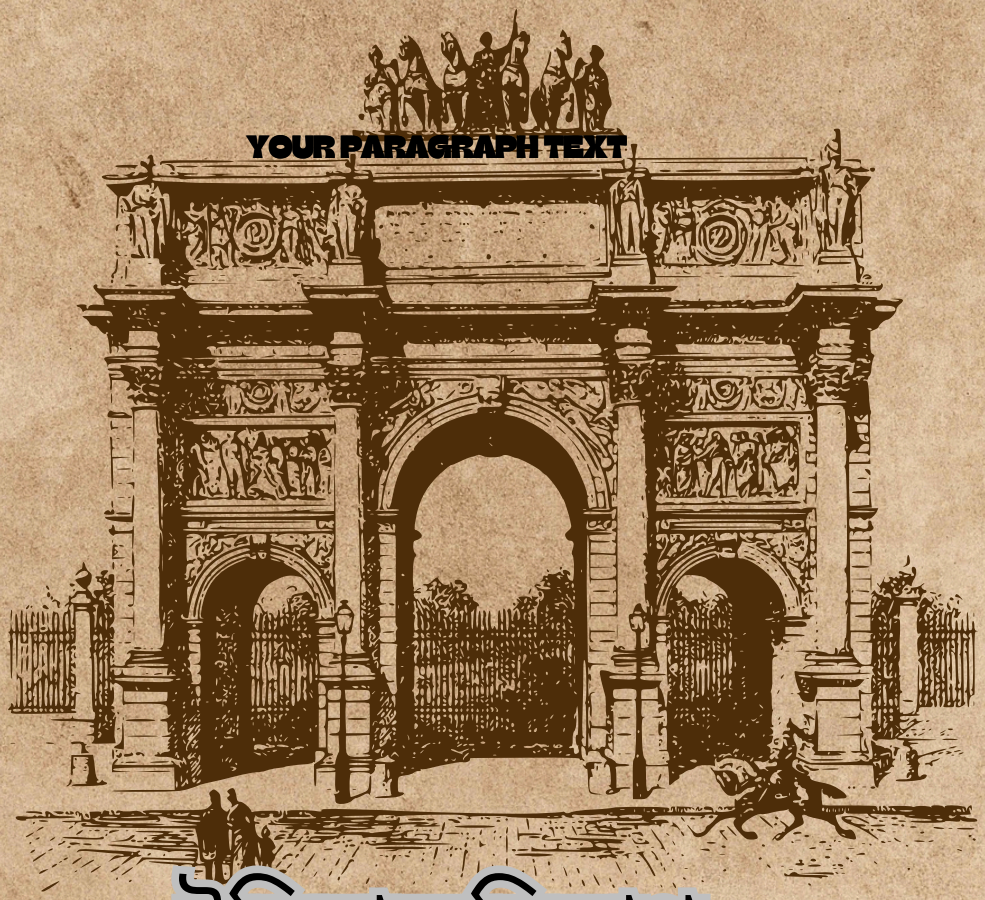

ইতিহাস বিভাগ

হাজী এ. কে. খান কলেজ

সূচীপত্র

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে	পৃ ২
সম্পাদকীয়	পৃ ৩
মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্প **Mst Sarmina Khatun**	পৃ ৪
মুর্শিদাবাদের অহংকার বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং স্বদেশপ্রেমী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী **Rejina khatun**	পৃ ৬
মুর্শিদাবাদ জেলার নশিপুর রাজবাড়ি **Barsha Ghosh**	পৃ ৭
একুশের অহংকার ও ভাষা শহীদ মুর্শিদাবাদের ছেলে বরকত **Monija Khatun**	পৃ ৮
ইতিহাসের সাক্ষী ব্যারাক স্কোয়ার **Nice Parvin Khatun**	পৃ ১১
মুর্শিদাবাদের মহিয়সী নারী মুন্নী বেগম **Ajema Ansari**	পৃ ১২
মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের কিছু ঐতিহ্যময় স্থান **Farhana Parvin**	পৃ ১৩
জগৎ শেঠের বাড়ির ইতিহাস **Roja Khatun**	পৃ ১৫
মুর্শিদাবাদ জেলা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা **Gopal sarkar**	পৃ ১৬
ইতিহাসের আলোকে শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয় **kasmoka Mondal**	পৃ ১৯

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে

প্রতি বছরের ন্যায় ইতিহাস বিভাগের আন্তর্জালিক পত্রিকা অন্বীক্ষা যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হোক। সম্পাদকমণ্ডলী এই বছর যে বিষয় নির্বাচন করেছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসার্হ। পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি। পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অভিনন্দনসহ

ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ

অধ্যক্ষ

হাজী এ. কে. খান কলেজ

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠকগণ,

আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগের এই ই-ম্যাগাজিনের সংস্করণটি উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যার বিষয়বস্তু হলো মুর্শিদাবাদের স্থানীয় ইতিহাস। পরীক্ষার চাপ ও ক্লাসের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ছাত্রছাত্রীরা যে লেখা জমা করেছে তাতেই এই পত্রিকাটি সমৃদ্ধ । এটুকু বলাই যায় আকারে খুব বেশি বড় না হলেও পত্রিকার লেখাগুলি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের স্বাদ পাওয়া যাবে। এই লেখাগুলি থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের সংবেদনশীল মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংস্করণে যে সব লেখা পাওয়া যাবে যাতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল ভাবনা ছাড়াও শিক্ষকদের আবেগ ও আগ্রহকে প্রতিফলিত করেছে।

এই ম্যাগাজিন টি তৈরীর ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতো যিনি সাহায্য করেছেন তিনি হলেন অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রী গৌতম কুমার ঘোষ এছাড়া আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা কলেজের অভ্যন্তরীণ মূল্যবান নির্ধারক আয়োগের আহ্বায়ক ডঃ পিয়ালী দাঁ মহাশয়ার সজাগদৃষ্টি পত্রিকা প্রকাশের কাজকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়াও অন্যান্য সহকর্মীদের থেকেও অনেক সুপরামর্শই পাওয়া গেছে এই পত্রিকাটি তৈরীর ক্ষেত্রে। আসল কথা হল এক সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলাফল হল এই ই-ম্যাগাজিন।

এরপর বলতেই হবে যে সব ভুল ত্রুটি রয়ে গেল তার দায় কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। যাদের লেখা প্রকাশিত হলো তারা এতে খুবই আনন্দিত হবে এবং আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা লিখতে উৎসাহিত হবে। এই যে প্রাপ্তি ই-ম্যাগাজিন থেকে হল তা নিতান্তই কম বলে মনে হয় না।

নমস্কারান্তে,

ডঃ চন্দ্রাণী পাল, কিশোর সরকার

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক

ইতিহাস বিভাগ

হাজী এ কে খান কলেজ

ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক প্রকাশিত

হরিহরপাড়ার ইতিহাস

হরিহরপাড়া হল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদর মহকুমার হরিহরপাড়া ব্লকের একটি গ্রাম। হরিহরপাড়া নামের উৎস সম্পর্কে দ্বিমত আছে। 'হরিহর' নামটির উৎপত্তি যদি হিন্দু দেবতা 'হরি'-র নামানুসারে হয় তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উত্থান এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের সাথে তার সম্পর্ক আছে। হরিভক্ত বৈষ্ণবদের বসবাস থেকে হরিহরপাড়া নাম হতে পারে। আবার এটাও অস্বাভাবিক নয় যে এই অঞ্চলে বসবাসকারী হরি কিংবা হরিহর নামে হোড় সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয়েছে হরিহরপাড়া। নামের উৎস যাই হোক না কেন, সময়ের গতির সাথে সাথে হরিহরপাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। হরিহরপাড়া থানার সীমায়িত ক্ষেত্রে তালিকার ক্রমিক নম্বর ৩২ এবং সীমাক্ষেত্রের আয়তন ২৯৭৩.১০ একর। অর্থাৎ গ্রামটির আয়তন ৪.৬৫ বর্গমাইল বা ১২.০৩ বর্গকি.মি.।

২০১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী হরিহরপাড়ার মোট জনসংখ্যা ১৪,৮১৭ যার মধ্যে ৭৬৫০ জন (৫১শতাংশ) পুরুষ এবং ৭২৫৭ জন (৪২ শতাংশ) মহিলা। ৬ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যা ১৭৬৯। হরিহপাড়ায় মোট স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ৯৮৯৪ জন।

গ্রামনাম হরিহরপাড়া উৎপত্তি সম্পর্কে প্রামান্য নথি পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে হরিহরপাড়া ও চোঁয়া গ্রাম এলাকা চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ভারত সম্রাট আকবর শাহের আমলে টোডরমল কর্তৃক ভূমির এলাকা বিভাজনে হরিহরপাড়া গ্রাম ছিল কুলবাড়িয়া পরগণার অন্তর্গত। বঙ্গদেশের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খানের আমলে কুলবাড়িয়া পরগণা বিভাজিত হয়। বিভাজিত পরগণার নাম হয়- আসাদনগর, মামলতপুর এবং রুকুনপুর। মামলতপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল গ্রাম হরিহরপাড়া।

হরিহরপাড়া মানুষের কাছে চোঁয়া সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। চন্দ্রদ্বীপ উর্বর অংশে হরিহরপাড়া এবং অনুর্বর অংশে চোঁয়া নামে পরিচিত ছিল। কথ্য ভাষায় গ্রামের যে অংশের মাটি শুষ্ক, জল দাঁড়ায় না বা ভালো উৎপাদন হয় না এমন স্থানে বসতি গড়ে উঠলে তার নাম হয় চোয়াপাড়া। ভূমির রকম ফেরে চোঁয়া মৌজা গ্রাম শুষ্ক। অথচ ভৌগোলিক পরিবেশ অতীব সুন্দর এবং মনোরম। চোঁয়া মৌজার পশ্চিম গাত্র বরাবর ছোট ভৈরব নদী এবং পূর্ব সীমানার অনতিদূরে ভৈরব নদী। মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিদেহ নদী। যা বর্তমানে চোঁয়ার বিদেহ বিল নামে পরিচিত। বিদেহ নদী আসলে ভৈরব নদীর শাখা।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার পর তারা ভারতে আসে ব্যবসা করতে। ঔপনিবেশিক আমলের নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি মুর্শিদাবাদের কৃষকরাও। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ হল চোঁয়ার নীলকুঠী। বর্তমান হরিহরপাড়া থানা ভবনটি এক সময় নীলকুঠি ছিল। এখানে নীলকর সাহেবরা বসবাস করতেন। থানার অপর দিকে রাস্তা পাড়ে ছিল নীলকুঠীর ভাটি। নীলগাছ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রঙ তৈরী করা হত। এখনও নীলচুল্লি ও চিমনির ধ্বংসাবশেষ ইতিহাসের ছোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার উৎপাদিত নীলের বড় অংশ উৎপাদিত হত মুর্শিদাবাদ থেকে।

হরিহরপাড়া এলাকায় রেশম উৎপাদিত হত ঔপনিবেশিক পর্বে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী থেকে রেশমের খোঁজে আসে মুর্শিদাবাদে। প্রাচীন কুঠি তৈরী করে কাশিমবাজারের বানজেটিয়ায়। কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন স্থানে কারখানা গড়ে ওঠে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালিকনায় জঙ্গীপুর, বালিয়াঘাটা, রাজারামপুর, কাকলামারী, চোঁয়া ইত্যাদি স্থানে রেশম কারাখানা স্থাপিত হয়। হরিহরপাড়া থানার শঙ্করপুর গ্রামেও রেশম কুঠি ও কারখানা ছিল।

চন্দ্রবংশীয় রাজারা সম্ভবত এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। বর্মন বংশের শাসক হরি বর্মনদেবের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল হরিহরপাড়া। হরি বর্মনদের নাম থেকে এই অঞ্চলের নাম হরিহরপাড়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হরি বর্মনদেবের ছিলেন গৌড়ের রাজা রাম পালের সমসাময়িক।

রুকুনপুর অঞ্চলে উঁচু নীচু বনবাদাড়ে ভরা রাজপরিবারের ধ্বংস্তুপ দেখা যায়। ধ্বংস্তুপের মধ্যে আছে রাজদরবার, বেগমমহল, খাসমহল। স্থাপত্যটির উত্তর পশ্চিম অংশে ছিল বেগমদের খাসমহল এবং বেগমমহল। এই দুই মহলের মাঝে ছিল দীঘি বা জলাশয়। সম্ভবত রাজপরিবারের মহিলারা এখানে স্নান করতেন। দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ছিল রাজদরবার। রাজদরবারের একেবারে পূর্ব অংশে ছিল সেনা ব্যারাক। বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চারপাশে পরিখা ঘেরা ছিল। বর্তমানে যেখানে হরিহরপাড়া বিডিও অফিস অবস্থিত সেখানে শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন এই মন্দির গুলি চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বের নিদর্শন।

হরিহরপাড়ার আর একটি ইতিহাস বিজড়িত স্থান হল সেখ বদরের ঢিবি। দিল্লীর সুলতানী যুগে সুফী মতবাদের প্রচার শুরু হয়। বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদও এর বাইরে ছিলনা। সম্ভবত সেখ বদর বা পীর বদর বা বদর-ই-আলম চোদ্দ শতাব্দীর শেষার্ধে এখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর আস্তানাই সেখ বদরের ঢিবি নামে পরিচিত। বর্তমানে ঐ স্থানে হরিহরপাড়ার মুসলিম জনসাধারণের কবরস্থান।

হরিহরপাড়ার হোসেনপুর গ্রামে আছে প্রাচীন শিব মন্দির এবং প্রাচীন মসজিদ। হোসেনপুর মসজিদ এবং গ্রাম পত্তন বিষয়ে অনেকে মনে করেন এটি ছিল গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহর কীর্তি আবার অনেকে এটিকে হোসেন শাহ নামক জনৈক পীরের নামের সাথে যুক্ত করেছেন।

বাংলার ইতিহাসের সুচনাকাল থেকেই হরিহরপাড়ার উল্লেখ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। কালের স্রোতে অনেক ঐতিহ্য বিলীন হয়ে গেছে। আবার অনেক ঐতিহ্য বিলীন হবার পথে। এগুলি সম্পর্কে আরও বেশী অনুসন্ধান হলে নিঃসন্দেহে বাংলার ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে।

তথ্য সংগ্রহ :

১। গুলনাজ খাতুন, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং-১, ২। দীপ্তি হালদার, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ৪০, ৩। মৌমি সরকার, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ৪৮, ৪। নউশিনআরা খাতুন বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ০৫, ৫। ইসমাতারা খাতুন, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ৪১, ৬। ফারুক আবদুল্লা, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ৩০, ৭। সামিম রেজা, বি.এ.প্রথম সেমিস্টার, ক্রমিক নং- ১৪

তথ্য সূত্র : অগ্নিবীণা, নজরুল স্মরণ সংখ্যা- ১৪২৬ ।। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: মদন সরকার, তমালতলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, চোঁয়া, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্প

Mst Sarmina Khatun
2nd Semester
Registration No. 045761 of 2022-2023

টিন ও তামার সংমিশ্রণে তৈরি একটি মিশ্র ধাতু হচ্ছে কাঁসা শিল্প। বাংলাদেশ ও ভারতে একসময় বিভিন্ন ধরনের অলংকার ও গৃহস্থালীর উপকরণ তৈরিতে পিতলের পাশাপাশি কাঁসা ব্যবহার করা হতো। অনেকের ধারণা,কাঁসা ও পিতল একই জিনিস। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কাঁসা ও পিতল এক জিনিস না। পিতল হচ্ছে দস্তা ও তামার সংকর ধাতু। চুলার ছাইয়ের সাথে একটু তেঁতুল দিয়ে ঘষামাজা করা ঝকঝকে কাঁসা-পিতলের থালা-বাটি,চামচ,জগ,কলসি,বালতি গত শতকের মাঝামাঝিতেও প্রচুর দেখা যেত।

বর্তমান যুগে যেমন-কোনো পরিবারের স্টেইনলেস স্টিলের জিনিস দ্বারা তাদের সচ্ছলতাকে নির্দেশ করে,তেমনি আগেকার যুগে ধনী পরিবারগুলোর কাঁসা ও পিতলের ব্যবহার দ্বারা ওই সব পরিবারের আভিজাত্য প্রকাশ পেত। এই তৈজসপত্র শুধু যে বহুদিন টিকে থাকত, তা-ই নয়,পরিবারে মূল্যবান সম্পদ হিসেবেও গণ্য হতো। সোনা-রূপার অলংকার পরে কাঁসা,পিতল ও তামার তৈজসপত্রই ছিল দামিসামগ্রী। সে কারণে আগে চোর -ডাকাতেরও নজর থাকত এসব থালাবাসনের প্রতি। এখনো অনেক ধনী পরিবার রান্নার কাজে কাঁসা বা পিতল ব্যবহার না করলেও কাঁসা ও পিতলের ফুলদানি,টেবিল ল্যাম্প,ঝাড়বাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে কাঁসা শিল্প অন্যতম। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে অথবা অষ্টাদশ শতক শুরুতে আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই নগরীকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কাঁসা শিল্পও বিকশিত হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খানের সময়কালে মুর্শিদাবাদের বড়নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে কাঁসা শিল্পীরা ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুলতে শুরু করে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন কাঁসার বাসনপত্র বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করতে শুরু করে। নবাব আলীবর্দী খানেরর আমলে বর্গীদের আক্রমণে অতিষ্ট কাঁসা শিল্পীরা বড়নগর ও ধননগর থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান খাগড়া, কান্দি, জঙ্গিপুর কাঁসারীপাড়া , পাঁচগ্রাম, জিয়াগঞ্জ এছাড়া ও বীরভূমের টিকরবেতা, পাথরকুচি, নদীয়ার নবদ্বীপ, মুড়োগাছা, মাটিয়ারী, বর্ধমানের দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই তারা ছোট ছোট কারখানা চালু করে বাসনপত্র তৈরি করতে শুরু করেন। মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্প শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসার তৈরি দ্রব্য ভারতের বাইরে ও রপ্তানি হত।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমে ঢাকা থেকে সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে কাঁসা শিল্পের ও প্রভাব পড়ে। একদা নবাব, রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে কাঁসা শিল্প বিকশিত হয়েছিল তা আজ প্রায় অবলুপ্ত। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং আধুনিকীকরণের অভাবে শিল্পটির দৈনদশা ক্রম অবক্ষয় ঘটছে।

মুর্শিদাবাদের অহংকার বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং স্বদেশপ্রেমী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

Rejina khatun

4th Semester

Reg- 058488 of 2022-2023

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষার একজন বিজ্ঞান লেখক। শুধু তাই নয় বাংলার একজন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সব থেকে বড় অবদান হলো - বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার নারীরা অরন্ধন ও উপবাস পালন করেন। তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। উপযুক্ত বইয়ের অভাবই ছিল এর মূল কারণ। তিনি প্রচুর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর কোনো মৌলিক গবেষণা বা আবিষ্কার নেই, তবে তিনি মূলত লেখনীর মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞের মর্যাদা লাভ করেছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ বাংলায় পাঠকের উপযোগী করে তুলে ধরেন।

যে সময় বিজ্ঞানশাস্ত্র ইংরেজি ভাষার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল, দুর্বোধ্য বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করে বিজ্ঞান শিক্ষা দুরূহ ছিল, তখন এই বাঙালি বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলো সহজতর করার জন্য বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাতৃভাষাতেই ব্যাখ্যা করতেন। সেসব বক্তৃতা শোনার জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্র এসে ভিড় করত তার কাছে। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্র কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯০৩ সালে সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অবসর নেয়ায় রামেন্দ্রসুন্দর ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সময় সমাজজীবনে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ছিল প্রখর। সামাজিক কুপ্রথা, জাতিগত বৈষম্য সমাজের দেহ-মনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। মানবধর্মই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির দ্বারা তিনি সব রকম অমানবিক প্রথার বিরোধিতা করতেন। বিজ্ঞানে কোনো মৌলিক গবেষণা করে রামেন্দ্রসুন্দর খ্যাতি লাভ করেননি ঠিকই, তবু দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি, বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য তার অবদান

অবিস্মরণীয়। বিজ্ঞানবিষয়ক বহু বই রচনা করে সাধারণের কাছে তিনি বিজ্ঞানকে সহজলভ্য করে তোলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যজীবনের শুরু সেই পাঠদ্দশায়। ২১ বছর বয়সেই নবজীবন পত্রিকায় তার প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' প্রকাশিত হয়। ক্রমে সাধনা, ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় এর উন্নতির জন্য আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। সেখানে তিনি বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তিনি এর প্রতিবাদস্বরূপ প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে উপাচার্য স্যার

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বাংলাতেই তাকে প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে বিজ্ঞান প্রচার তার একটি অসাধ্য সাধন কাজ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সব থেকে বড় অবদান হলো - বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার নারীরা অরন্ধন ও উপবাস পালন করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় এ সময় তিনি রচনা করেন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬) গ্রন্থখানি। তাঁর রচনা মুক্তচিন্তার আলোকে দীপ্ত ও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৩), কর্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০), নানাকথা (১৯২৪) প্রভৃতি। প্রথমটি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। শব্দকথায় বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। আর নানাকথায় স্থান পেয়েছে যুগ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, শিক্ষানীতি ও সমাজধর্মের কতিপয় প্রচলিত সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞান এর যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পান্ডিত্য ছিল বহুমুখী।

মুর্শিদাবাদ জেলার নশিপুর রাজবাড়ি

Barsha Ghosh
2nd Semester
Registration No. – 045752 of 2022-2023

নশিপুর হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার মুর্শিদাবাদ -জিয়াগঞ্জ সিডি ব্লকের একটি গ্রাম। নশিপুর রাজ পরিবারের নশিপুর রাজবাড়ি নশিপুরে রাজা দেবী সিংহের নির্মিত পুরাতন প্রাসাদের পাশে অবস্থিত। বর্তমান প্রাসাদটি ১৮৬৫ সালে রাজা কীতি চন্দ্র সিংহ বাহাদুর দ্বারা নির্মিত হয়ে ছিল। এটি দেবী সিংহের দরবার ছিল, যিনি বিট্রিশ রাজের সময় কর আদায়কারী হিসাবে ঐতিহাসিক ভাবে বিখ্যাত। তিনি "পানিপথ "থেকে এসে ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ শুরু করেন।বিচারের পর তিনি দেওয়ান রেজা খানের অধীনে রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ পেতে সফল হন। যারা তাকে সময় মতো কর দিতে ব্যর্থ হন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং সেই বিভাগের প্রধান হন। দেবী সিংহ নশিপুর রাজ পরিবারের ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুখ্যাত রাজা দেবী সিংহ সূদর পানিপথ থেকে বাংলায় এসেছিলাম মূলত ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। পলাশির যুদ্ধের ঠিক পরে তিনি ব্যবসায় বিশেষ প্রতিপত্তি করতে না পেরে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আদায়ের দেওয়ান রেজাখাঁর সাথে সখ্যতা করেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংস এর বিশেষ প্রিয়পাত্রে পরিনত হন। কালক্রমে বিট্রিশ শাসকেরা তাকে রংপুর ও দিনাজপুরের রাজস্ব সংগ্রাহকের কাজে নিযুক্ত করেন। এই খাজনা আদায়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ন নির্মম আর ভীষণ অত্যাচারী | তার অত্যাচারের কথা ওই এলাকার মানুষের মনে আতঙ্কের ছাপ ফেলেছিল । উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও কুরূপ দর্শনের জন্য ভীতু প্রজাবর্গ তাকে মহিষাসুর অখ্যা দিয়েছিলেন। দেবি সিংহকে পরিবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজা উপাধি প্রদান করেন, এবং তিনি নশিপুর রাজা হন। তিনি বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন পাপ মোচনের জন্য। তার জমিদারির অধিকাংশ আয় দেবতা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র মানুষের সেবার ব্যয় করতেন। রাজা উদমন্ত সিংহের নাতি রাজা কীর্তি চাঁদ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাজার দুয়ারীর আদলে বর্তমান নশিপুর রাজবাড়িটি নির্মান করেছিলেন।

একুশের অহংকার ও ভাষা শহীদ মুর্শিদাবাদের ছেলে বরকত

Monija Khatun

2nd Semester

Registration No. 045758 of 2022-2023

ভারতবর্ষ যখন সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় মত্ত ঠিক সেই সময় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জুন মতান্তরে ১৩ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অধীনে বাবলা গ্রামে বরকত জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল সামসুজ্জোহা মাতা ছিলেন হাসিনা বেগম ।বরকতের ডাক নাম ছিল আবাই। শিশু বয়স থেকে তিনি ছিলেন মেধাবী । গৃহ শিক্ষক মৌলাবক্স মল্লিক এর কাছে তার পড়াশোনার হাতে খড়ি। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন সেখানে ১৯৪৫খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে কৃতিত্বের সাথে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন ।তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অনার্স সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে পাকিস্তানী পুলিশ কর্তৃক তিনি গুলিবিদ্ধ হন।ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগের জন্য ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার বরকতকে একুশে পদক প্রদান করেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার স্মরণে ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার জীবনী নিয়ে বায়ান্নর মিছিল নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে।

উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা নয়,মূলত এই গর্বত্ববোধ ঘোষণায় পূর্বপাকিস্তানে বসবাস কারী বাংলা ভাষা-ভাষীর মানুষের বিবেকে প্রচন্ড আঘাত হানলো। ভাষা রূপায়ণের এই কথা ঘোষণা করেছিলেন পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল মহ: আলি জিন্নাহ।প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ খান ছিলেন সহযোগী পৃষ্ঠপোষক। ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে বিতর্ক ।১৯৪৭ সালে একদিকে তখন ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যস্ত দেশ ভাগ নিয়ে। যা ডক্লিফ লাইনের কাঁটাতার দিয়ে বেঁধে দেয়া হচ্ছে সীমানা। এই দেশটা আমার ওই দেশটা তোমার!! ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যার পর রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ কে পূর্ব

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে ,মধ্যরাতে আবার বলা হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ ভারতের সঙ্গেই থাকবে।এমন পরিস্থিতির শিকার হয় আবুল বরকত। ১৯৪৮ সালের লাহোরের গণপরিষদে পূর্ব বাংলা নির্বাচিত প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের স্বপক্ষে প্রস্তাব তুলে ধরেন বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মানা উচিত। তবে তার এই প্রস্তাব টেকেনি পাক শাসক গরিষ্ঠ দলের কাছে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী অহংকারী ভাষায় বলেন যে পাকিস্তান যখন মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র তখন উর্দুই হবে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ভারতে যেমন হিন্দি কে নিয়ে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা তৈরীর খেলা ,তেমনি পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার ভার চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীগণ তাদের মাতৃভাষা দাবি নিয়ে পথে নামতে বাধ্য হয় কারণ যদি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাকে অবহেলিত করা হবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ চাকরির ক্ষেত্রেও ভাষাগত ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১৯৪৮ সালের গণপরিষদের ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া হয় সারা বাংলাদেশ এই ঘটনার প্রতিবাদে জ্বলতে থাকে এবং মাতৃভাষা আন্দোলনে তারা ছিল অপেক্ষায় অপেক্ষমান।প্রতিবাদের বহুশিখায় পূর্ব পাকিস্থান ও জ্বলে উঠলো দাও দাও করে।জেলাগুলোও হয়ে উঠলো উত্তাল।"যাক প্রাণ যাক মান" আন্দোলনকারী জনগণের এই ছিলো মূল অপাত্যবাক্য। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী,ছাত্র,সাহিত্যিক, অধ্যাপক সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জে উঠলো। মাতৃভাষা চাই...মাতৃভাষা চাই...তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহাম্মদ নাজিমুদ্দিন নিশুধ করেন এই মিছিল।

১৯৫২সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ফলশ্রুতি প্রকাশ পায়।পাকিস্থানি পুলিশ ধারশায়ী করেন অনেক নিরীহ মানুষকে। সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে,আর সেখানেই পুলিশের সাথে খন্ড যুদ্ধ বাঁধে। শহিদুল্লাহ প্রথম মাতৃভাষা দিবসের সভা ডাকেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রা ও সভা ডাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।সেই সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বন্দুক চালায়।ঢাকায় মিটিং এ যোগ দান করতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জাব্বার। আবুল বরকত এতক্ষণ পুলিশের সাথে বিক্ষোভ রত অবস্থায় ছিলো,হটাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েন।একে একে সালাম,রফিক ও শহীদ হলেন মরণজয়ী

ছাত্ররূপে...সেই সাথে বাংলার নাম না জানা শত সন্তান হারিয়েছিল প্রাণ।তাদের রক্তে ফুটে উঠেছিল আল্পনা রাজপথে!...

অবশেষে মরণজয়ী পূজারীদের প্রতি জানাই কবিতা দিয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি...

"হে বীর শ্রেষ্ঠ তোমাদের
লাগি মাতৃভাষা পেয়েছে
সন্মান...
মৃত্যু ভয় মানো নাই
দিয়েছো আত্মবলিদা
তোমাদের স্মরণে মিনার
চিহ্ন কালের পাহারা হয়ে
রবে!
অন্তঃস্থল থেকে জানাই
শ্রদ্ধাঞ্জলি মনে করি
তোমাদের সে দান...
তোমাদের রক্ত যায়নি বৃথা
পেয়েছি মোরা মাতৃভাষা!
২১আমাদের স্মরণীয়,
বরণীয় দিন....
২১নয় শোকের প্রতীক
২১হলো অহংকারের
প্রতীক!"

ইতিহাসের সাক্ষী ব্যারাক স্কোয়ার

Nice Parvin Khatun

4th Semester

Registration No. 058483 of 2021-2022

মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাসের অন্যতম কেন্দ্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য ব্রিটিশের কাছে প্রথম অস্তমিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। ১৭৫৭ সালের সিরাজদৌলার পতনের পর বণিকের মানদণ্ড পরিণত হয়েছিল রাজদণ্ডে। আবার এই জেলার বহরমপুর শহরের ব্যারাক স্কোয়ার প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। অনেকের মতে, ১৮৫৭ সালের ২৬ শে জানুয়ারি এই ব্যারাক স্কোয়ার থেকেই মহাবিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল। এনফিল্ড রাইফেলের টোটাল সহ ইংরেজদের অন্যায় শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বহরমপুর সেনা ছাউনির 19 নেটিভ রেজিমেন্ট বা পদাতিক বাহিনীর কিছু সেনা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । । সেদিন এই মাঠে বিদ্রোহী সেনাদের কামানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিল ব্রিটিশরা । চেষ্টা করেছিল বিদ্রোহ দমনের । কয়েকশো পদাতিক বাহিনীকে সেদিন যে কামানগুলির সামনে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।

1765 সালে মিরজ়াফরের কাছ থেকে 400 বিঘা জমি চেয়ে নিয়ে বহরমপুর শহরে ক্যানটনমেন্ট গড়ে তোলে ব্রিটিশ বাহিনী । সিরাজ পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের তৈরি ক্রীড়নক নবাবদের ওপর লক্ষ্য রাখতে ব্যারাক স্কোয়ার মাঠের ১২০ বিঘা জমির ওপর তৈরি করা হয় এই ক্যান্টনমেন্ট। 1765 থেকে 1767-র মধ্যে গড়ে ওঠে বহরমপুর। বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারের পূর্ব প্রান্তে তৈরি করা হয় ওল্ড কালেক্টরেট বিল্ডিং । যেখানে 1869 থেকে 1874 সাল পর্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর মাঠের চারদিকে সেনাদের থাকার জন্য শিবির তৈরি করা হয় । সেই বিল্ডিংগুলি আজও অক্ষত হয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে । যার নিদর্শন চারিদিকে আজও আছে। বর্গাকার এই ময়দানের চারদিকে রয়েছে চারটি কামান। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দান।

মুর্শিদাবাদের মহিয়সী নারী মুন্নী বেগম

Ajema Ansari
2nd Semester
Registration No. 045748 of 2022-2023

মুর্শিদাবাদ আমাদের মাতৃভূমি। এই জেলার ইতিহাস দেখতে গেলে আমরা আগের দিনের অনেক মহিয়সী নারীদের কথা জানতে পারি। তারা ছিলেন অনেক বিদুষী, সহনশীল এবং প্রতিভা ও দানশীলতায় উদ্ভাসিতা। এই চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করতে গেলে মুন্নী বেগম, রানী ভবানী ও রানী অন্নকালি অবশ্যই স্মরণীয়।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে দানশীলতায় মুন্নী বেগম ছিলেন একটি স্মরণীয় নাম। তিনি পেশায় ছিলেন একজন নর্তকী। মুন্নী বেগম জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরপ্রদেশে। তার মা তাকে ছোটো বেলাতেই বিশু নামের এক নর্তকীর কাছে বিক্রি করে দেন। বিশু তাকে নাচ শিখিয়ে নিজের নর্তকী দলের একটি সদস্য করে নেয়। তিনি তাঁর সৌন্দর্যের জন্য খুব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তার রূপে মোহিত হয়ে মীরজাফর তাকে বিবাহ করেন এবং তাকে দ্বিতীয় বেগমের মর্যাদা দিয়ে হারেমে তোলেন। চতুর মুন্নী বেগম খুব তাড়াতাড়ি হারেমের প্রধান হয়ে ওঠেন। মীরজাফরের কাছে তিনি তার প্রথম স্ত্রীর চাইতেও প্রিয় হয়ে ওঠেন। মুন্নী বেগম এর মত একজন সাধারণ নর্তকীর মধ্যে ছিল উচ্চমানসিকতা, নিরপেক্ষতা মানবতাবোধ এবং আদর্শ। তার জনহিতকর কাজই প্রমাণ করেছে তার আদর্শের আর তার প্রতিফলন ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নবাবী রাজত্বে। বস্তুত পক্ষে তিনি অসামান্য ও অনন্য। পলাশীর যুদ্ধে রবর্ট ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলা কে পরাজিত করলে মীরজাফর হয়ে ওঠেন নবাব এবং মুন্নি বেগম নবাব স্ত্রী। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু ঘটলে মুন্নি বেগম মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এক গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করেন তার বিচক্ষণতা এবং উদারতার মাধ্যমে। তিনি ইংরেজদের পৃষঠপোষক ছিলেন। তাছাড়াও রাজনৈতিক দিকে ইংরেজদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সাহায্য করা ছিল তার মুখ্য ভূমিকা। যার ফলে কোম্পানি খুশি হয়ে তাকে "মাদার ইন ইন্ডিয়া" বলে আলংকিত করেন। মুন্নি বেগম এর রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। রবার্ট ক্লাইভ ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেন। টাকা দেওয়ার ফলে তার পুত্রদের সনদে বসা নিশ্চিত হয়। তিনি নবাব পরিবারে সব চেয়ে প্রভাবশালী মহিলা সদস্য হয়ে ওঠেন। তিনি সম্পত্তি ও রাজপ্রাসাদের দেখ ভাল করতেন। ইংরেজ কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী সনদ লাভ করেন তখন মুন্নি বেগম এর পুত্র নাজিম উদদীন আলী খান টাকার বিনিময়ে নবাবী সিংহাসনে বসেন। ফলে তার প্রভাব আরো বেড়ে যায়। ১৭৬৬ সালে তার আকস্মিক মৃত্যু হয় ফলে মুন্নি বেগমের আরেক পুত্র নজাবত আলী খান সিংহাসনে বসে নবাব হন। সেই সময় বসন্ত রোগের সংক্রামক এর ফলে তারও অকাল মৃত্যু হয়। ১৭৭০ সালে তার মৃত্যুর ফলে মীরজাফরের তৃতীয় স্ত্রী বাব্বু বেগমের পুত্র

আশরাফ আলী খান নবাব হন। যার ফলে রাজপ্রাসাদে মুন্নি বেগমের প্রভাব কমে গিয়ে বাব্বু বেগমের প্রভাব বেড়ে যায়। তারপর তিনি নায়েব নাজিম ও রেজা খান কে দুর্নীতির অভিযোগে সরিয়ে দিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করেন। রানী ভবানী তাকে একটি পালকি উপহার দিয়েছিলেন যেটি বহন করতে ত্রিশ জন লোক লাগে।

মুন্নী বেগম দানশীল মুসলিম মহিলা হলেও হিন্দুদের উপর কখনো বিরূপ মনোভাব ও খারাপ আচরণ কোরেন নি। হিন্দু, মুসলিম, অনাথ, দুঃস্থ, ভিকারি, দরবেশ, ফকির এবং অসহায় হিন্দুদের সাহায্য ও সহোগিতা করেছেন। এমনকি তিনি অসহায়দের সাহায্যের জন্যে অনেক অর্থ মুক্ত হস্তে দান করেছেন। মুসলিমদের বেড়া ভাসা উৎসব ও হিন্দুদের দেওয়ালী, হোলি উৎসব এর জন্যে সেই সময় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি ব্যায় করতেন। কোম্পানির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক থাকার জন্য ওয়ারেন্ট হেস্টিং তাকে মাসিক ১২ হাজার টাকা বৃত্তি দিতেন। এছাড়াও সেই সময় মুন্নী বেগম পর্দানশিন বেগম পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন যার কারনে ইংরেজ কোম্পানি তাকে বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি দিতেন। এবং তিনি ওই প্রাপ্ত টাকা থেকে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতেন। সেই টাকা তিনি সর্ত সাপেক্ষে দলিল মূলে কোম্পানিকে ফিরিয়ে দেন। উক্ত টাকার সুদ থেকে তিনি তার নির্মিত বিদ্যালয় এর খরচ পত্র চালাতেন। মুন্নী বেগম তার জীবদ্দশায় অনেক প্রজাহিতকর কাজ করে গেছেন। ১৭৫৭ সালে তিনি মুর্শিদাবাদে চক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি এই মসজিদ টি নির্মাণ করার জন্য তার নাম অনুসারে এই মসজিদকে বেগম মসজিদ ও বলা হয়। এই মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বাজার বসত। আজও সেই বাজারের নাম রয়ে গেছে চাঁদনিচক। সেই সময় ওই বাজারে হীরা, সোনা, চাদি এবং মূল্যবান জিনিস পত্র কেনাবেচা হতো এমনকি সেখানে দাস দাসীও বিক্রি করা হত। দিল্লি থেকে যেসব নর্তকীদের সাথে বাদ্যযন্ত্রি মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বীণা বাদক ছিলেন ওয়াদেজ আলী। তার বীণা বাদনে ছিল অপূর্ব সুর। তার সেই সুরে মোহিত হয়ে মুন্নি বেগম খুশি হয়ে চক মসজিদটি তাকে উপহার হিসেবে দান করেন। তারপর থেকে ওয়াজেদ আলী সেখানেই বসবাস শুরু করে। এবং সেখানেই ওয়াজেদ আলীর মৃত্যু ঘটে।

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুন্নী বেগম ছিলেন উদারতায় ও দানশীলতায় এক মহত্বের প্রতীক। তাই বলা যায় মুর্শিদাবাদের নবাবী ইতিহাসে মুন্নী বেগম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে চির স্বরনীয় হয়ে থাকবে। ১৮১৩ সালে ১০ জানুয়ারি তিনি ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে ইউনিয়ন সবাই মিলে ৯০ বার তোপধ্বনি করেন। এবং তাকে তার স্বামী মীরজাফরের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের কিছু ঐতিহ্যময় স্থান

Farhana Parvin
2nd Semester
Reg NO - 045753 of 2022-2023

লালবাগ স্থান টি আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঐতিহাসিক জায়গা। প্রথমেই আসবে নবাব হুমায়ন যার প্রাসাদ হাজারদুয়ারি | বিরাট এই স্থাপত্যটি এখন একটি মিউজিয়াম বা জাদুঘর। এখানে সুরক্ষিত রয়েছে নবাব দের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। যার মধ্যে রয়েছে আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজের তরবারি। এমন কি যে অস্ত্র দিয়ে সিরাজ কে হত্যা করা হয় সেটাও এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত। এমনকি এই রাজপ্রাসাদে দেখা যায় রুপোর সিংহাসন যেটি ব্রিটিশ মহারানী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া উপহার | একই জায়গায় দেখা যায় ইমাম বাড়ি , যেখানে ঢুকতে না পারলেও এর বিশালত্ব মুগ্ধ করে তোলে।

এছাড়াও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকে ছুয়ে দেখার জন্য দেখতে পারি সন্ধ্যে বেলার কাটরা মসজিদের শান্ত রূপ। বাংলার শেষ নবাব মুর্শিদকুলি খান, মীর জাফর, ঘসেটি বেগম তথা রাজনীতি , বিশ্বাসঘাতকতা , ক্ষমতার উত্থান - পতন সবই রয়েছে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে। এর মধ্যে অন্যতম হল কাটরা মসজিদ।

নবাব মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নামানুসারে নতুন রাজধানীর নাম হয় মুর্শিদাবাদ। কাটরা মসজিদটি নতুন রাজধানীর জামে মসজিদ হিসেবে তৈরী করা হয়। সম্পূর্ণ মসজিদটি আকারে চতুর্ভূজাকৃতি, পুরো মসজিদটিতে অনেক সুদৃশ্য খিলান রয়েছে। মসজিদের সামনের দিকে রয়েছে বহুভাঁজযুক্ত খিলানের মধ্যে পাঁচটি প্রবেশ খিলান। মসজিদটি আয়তাকৃতির পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট । এটি ইঁট দিয়ে তৈরি এবং চারকোনায় চারটি বিশাল মিনার অবস্থিত। কাটরা মসজিদের প্রবেশ বেদীর নীচে একটি ছোট্ট ঘরে রয়েছে মুর্শিদকুলি খান এর সমাধি।

নৌকা করে ভাগীরথী পেরিয়ে খোশবাগ রয়েছে। খোশবাগ , রোশনীবাগ শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে বিরাজ করছে। খোশবাগ হল আনন্দবাগিচা সেখানে রয়েছে আলিবর্দি খাঁ, সিরাজদ্দৌলা, লুৎফাউন্নিসা সহ নবাব পরিবারের বিশিষ্ট জনের সমাধি | রোশনিবাগে সুশোভিত উদ্যানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন নবাব এবং তাঁর পরিজনেরা এছাড়াও লালবাগে রয়েছে কদমশরীফ, তোপখানায় জাহানকোষা কামান , মোতিঝিল ইত্যাদি।

জগৎ শেঠের বাড়ির ইতিহাস

Roja Khatun

2nd Semester

Registration No. 045765 of 2022-2023

অষ্টাদশ শতকে বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত ধনী,"জগৎ শেঠ "কোনো এক জন ব্যক্তি নন।" জগৎ শেঠ " একটি পারিবারিক উপাধি। বিপুল ধনসম্পদ ও সেই সুবাদে প্রভূত রাজনৈতিক খমতা ভোগ কারী এই পারিবারিক আবাস ছিল, সেই সময় কালে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। জগৎ শেঠ আদতে বাংলার মানুষ নন। তাঁদের আদি নিবাস রাজস্থানের যোধপুরের নাগের অঞ্চলে। প্রথমে তাঁরা শেতাম্বর জৈন ধর্মের লোক ছিলেন। পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় হীরানন্দ শাহু নমে এক ব্যক্তি যোধপুর থেকে পাটনায় আসেন। অসম্ভব দরিদ্র হীরানন্দ দুঃখে জীবন চালাতেন।এমন সময় একদিন তিনি পাটনার এক জঙ্গল প্রবেশ করে। সেখানে কারো আর্তনাদ শুনে তা অনুসরণ করে একটি ভাঙা প্রাসাদে পৌছান। সেখানে দেখেন এক মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। হীরানন্দ তার যথা সাধ্য সেবা করলেও সেই বৃদ্ধ মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি হীরানন্দ কে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যান। এই গুপ্তধনের মধ্যে নাকি প্রচুর স্বর্ণ মূদ্রা ছিল। এই সোনাই হীরানন্দ এর বংশকে ধনী করে তোলে। হীরানন্দ তার সাত পুত্রকে ভারতের সাত জায়গায় গদিয়ান করে দেন। কনিষ্ঠ পুত্র মানিক চাদ আসে মুর্শিদাবাদে তিনিই জগৎ শেঠ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

Gopal sarkar
2nd Semester
Registration Number 045775 of 2022-2023

কোনোদিনই পরিকল্পনা করে ভ্রমণ করিনি । আগের দিন ঠিক হলো মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ করতে যাবো বাসে করে । কিন্তু বাস যাত্রার নিদারুণ অভিজ্ঞতা হলো, কারণ রাস্তায় কাজ হচ্ছে । তাই সাড়ে এগারোটায় চেপে বহরমপুর পৌঁছালাম সন্ধ্যা ছটায়। উঠলাম বহরমপুর হোটেলে। এছাড়া ও এখানে ট্রেন এ যাতায়াতের সুবিধাও রয়েছে সেইটা খুব আরাম দায়ক বলে আমার মনে হয় । কবি বন্ধু অমল রায়কে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি তাকে নিলাম । সে বাইক নিয়ে এসেছিল ।

• পরের দিন মঙ্গলবার । সকালের প্রথম ভ্রমণ এখানকার লালদিঘি, বিশাল এই দীঘি সন্ধ্যায় অপরূপ হয়ে ওঠে । শহর বিশাল, সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হচ্ছে রবীন্দ্রসদনে, বিশাল রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আছে । সন্ধ্যায় সেখানেই আড্ডায় বসলাম আমার কিছু বন্ধু- বান্ধবী দের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ । নয়টায় গাড়ি এলে আমরা জ্যাম পেরিয়ে প্রথম দেখলাম পুরোনো কাশিমবাজার রাজবাড়ি। দেখলাম গাড়ি থেকেই । এটি বন্ধ থাকে এবং সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রায়। পাতালেশ্বর শিবমন্দির ও সতীদাহ ঘাট দেখলাম সেই জায়গাটি বেশ মনোরম এবং গাছপালায় ভরা। কিন্তু পরের যাত্রা করলাম আমরা অন্য কোথাও। সেইটা হলো - এরপরে আমরা কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মার্বেল শোভিত প্রাসাদ ও প্রদর্শণীশালাটি বেশ চমৎকার। ত্রিশটাকা করে এক - এক জনের দেখা র মূল্য। একজন স্থানীয় অভিজ্ঞ পুরূষ গাইড আমরা নিলাম । তিনি আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখালেন এবং বললেন, বাংলা ধারাবাহিকের বা সিনেমার শুটিং এখানে হয়। এখন এটি বিয়ে বাড়ি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে র জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

• মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ করতে করতে আমরা এপর্যায়ে কাশিমবাজার রাজবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে অনেক ইতিহাস রয়েছে,সেখানে ঝাড়বাতির আলো পেরিয়ে অন্ধকার টের পাওয়া যায় নাচমহল-এ। কাছারি বাড়ির অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা সামনে আসে। আবার এসব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নাটমন্দির, গোবিন্দ সেবা, দুর্গা পুজো। কাশিমবাজার রাজবাড়ী আর রেল স্টেশনের মাঝে ইংরেজদের এক ভগ্ন প্রায় সমাধিক্ষেত্র আছে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর স্ত্রী ও কন্যার সমাধি

ছাড়াও আরো অনেকের সমাধি গাড়ি থেকেই দেখলাম। ডাচ বণিকদের সমাধি সেও দূর থেকেই আমরা আমাদের নিজেদের চোখ দিয়ে দেখলাম । তা এক অপরূপ দৃশ্য ,যা কোনো দিন ভোলার নয় ।এরপর আসলাম আমরা কুখ্যাত ডাকাত দেবী সিংয়ের নশীপুর রাজবাড়িতে। দক্ষিনা প্রত্যেকের দশ টাকা। বেশ বিশাল মহল, সেইটা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। এখানে আমরা একটা কুড়ি টাকার গাইড নিয়ে আমরা এই জায়গাটি সম্পর্কে আমাদের কে বুঝিয়ে দিলেন বেশ ভালো যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে । এক অত্যাচারী লম্পট লোকের কাহিনী এবং তার কিছু চিহ্ন এখনো দেওয়ালে, মেঝেতে বর্তমান। মন্বতর ও তার পাপী মনে কোনো অনুতাপ আনেনি। হিরাবাই-এর ছবি কতটা সত্য তা বহন করে তা জানা নেই। তবে সেই খাজনা আদায়ের খাতাগুলি আজও বুকে আতঙ্ক জাগায় আমাদের সকলের মনে । ইনি আবার দেবী ভবানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে একটি সংগ্রহশালা আছে এবং বর্তমান এক শিল্পীর কিছু কাজ চোখে পড়ার মতো। কিছু ছবি তোলা হলো কারণ হাজারদুয়ারী-এর অনুকরণে এটি নির্মাণ করেন দেবী সিংহের ভাইপো বা দত্তক পুত্র বলবন্ত সিং।

• নশীপুর রাজবাড়ী হতে উত্তর পূর্ব দিকে আমরা গেলাম কাঠগোলা বাগানবাড়িতে। সুন্দর গাছপালা দিয়ে ছাওয়া মনের মতো একটা জায়গা পেলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে যেমন হনুমান দেখতে পেলাম তেমন -ই সাদা পাথরের চার অশ্বারোহী মূর্তি বাগান পাহারা দিচ্ছেন তাও সেখানে দেখা যাচ্ছে।এখানেও টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এবং জানার আগ্রহ থাকলে একজন গাইড ভাড়া করা অবশ্যই দরকার। সে আবার শেষে ছন্দ মিলিয়ে যদি বলে তবে আনন্দ তো আরো দ্বিগুন হয় সেইটা আমাদের সকলের কাছে । গোপন জলপথ ও কুয়ো দেখলাম আমরা সকলে -ই । মর্মর মূর্তিগুলি কিন্তু অপূর্ব শিল্প শৈলীর পরিচয় দেয়। কিভাবে যে সেগুলি মানুষের হাতে নষ্ট হচ্ছে তাও দেখলাম। কিছু বিদেশি মাছ আর কিছু পাখি নিয়ে ছোট চিড়িয়াখানা এদের আয়ের আরেকটা অন্যতম সুন্দর দিক । রাজবাড়ীর ভিতরে নানা আয়না, মাঝখানে নানা আসন। যেখানে বসে বিচার করা যায় কিংবা আলোচনা। আবার একরকম আয়নায় নিজের শরীর দেখতে পেলেও মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। আবার খাবার টেবিলের উপরে একটি গোলকে দেখা যায় সিসি টিভির মতো দূরের মানুষ। বেলজিয়াম কাচের আয়না দর্শকের মুখকে উজ্জ্বল ভাবে পরিবেশন করেছিল। জিয়াগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপৎ সিং-এর পূর্বপুরুষ লছমিপত সিং এটি তৈরি করেন। এঁরা জৈন সম্প্রদায়ের । একটি পুকুরে মাছ পালন করেন। মাছ মারা গেলে মাছেদের সমাধি দেন ও মর্মর

মূর্তি নির্মাণ করেন। এখানে পরেশনাথের মন্দিরটি খুব সুন্দর। মার্বেলের মূর্তি, হাতির দাঁতে তৈরি থাম এবং নানা গাছ ও ফুলের সমারোহ জায়গাটিকে পবিত্র করে তুলেছে। অনেক পর্যটক এসেছিল সেদিন। ফেরবার পথে হনুমানের দলের সাথে দেখা হলো। বেশ ভিখারিদের মতো ঘিরে ধরেছে আমাদের -কে । এইরকম অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা আমাদের হল ।

• এরপর আমরা সকলে হাজার দুয়ারী র উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এবং সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে,তাই আমরা সকলে মাথাপিছু ২৫ টাকা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করলাম এবং এরপরে আমরা একজন অভিজ্ঞ গাইড কে নিলাম হাজার দুয়ারী র ইতিহাস জানার জন্য , এরপর তিনি আমাদের - কে অতি সুন্দর দক্ষতার সঙ্গে আমাদের - কে হাজার দুয়ারী সম্পর্কে বললেন, এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে ডানদিকে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে ওয়াচ টাওয়ার ঘড়ি রয়েছে, যার পাশে রয়েছে ইমামবাড়া মসজিদ সেইটি বছরে মহরমের সাত দিন খোলা থাকে আর বাকি দিনগুলো বন্ধ থাকে এছাড়াও হাজার দুয়ারী তে ৯০০ টি নকল দরজা ও ১০০ টি আসল দরজা দেখলাম সেইগুলো ও খুব সুন্দর , এছাড়া ও ভিতরে র দিকে অনেক রকম পুরোনো দিনের বিভিন্ন রাজার ও রাণীর মূর্তি আজ ও সুসজ্জিত অবস্থায় জীবন্তরূপ ধারণ করে রয়েছে । অন্যদিকে চিএকলার অপরূপ সৌন্দর্য্য ,নকশা , পেইন্টিং ও বিভিন্ন জলরং ও তেল রং এর উপর অঙ্কিত চিত্র রয়েছে ,যে গুলো সেই যুগের নামকরা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র হাতে অঙ্কিত ছবি , যার মূল্য বর্তমান বাজারে আকাশ ছোঁয়া , সত্যি - ই এত এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ও ইতিহাস দেখে আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

• এরপরে আমরা সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে আরও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান নির্দশন করলাম । সেইগুলো র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যথা - কাটরা মসজিদ, মুন্নি বেগমের চক মসজিদ, ফৌতি মসজিদ, জগৎ শেঠের পুরোনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ, ত্রিপলি গেট - বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যাওয়ার গেট , আজিমুন্নেসা বেগমের জীবন্ত সমাধি , নিউ মতিঝিল ইত্যাদি জায়গা গুলো দর্শন করে খুব ভালো লাগলো আমাদের ।এই অপূর্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যা কোনো দিন ভোলার নয়, তা ইতিহাস এর পাতায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে।এরপরে আমরা সেইখান থেকে বেরিয়ে লালবাগে নামকরা হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে আমরা আমাদের সকলের নিজ নিজ বাড়ি উদ্দেশ্যে গন্তব্য স্থলে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম । এইভাবে আমরা একটা সুন্দর দিনের অভিজ্ঞতা -র সাক্ষী হলাম আমরা সকলে ।

ইতিহাসের আলোকে শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয়

কাশমোকা মণ্ডল

প্রাক্তনী

উনবিংশ শতক ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাসে এক স্বর্ণময় যুগ ।এই সময় থেকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাতে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে গড়ে উঠেছিল এক উদারনৈতিক ,আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেকটাই শহরকেন্দ্রিক। যার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বাংলার গ্রাম সমাজ। তার ব্যতিক্রম হয়নি ডোমকল থানার অন্তর্গত এক প্রত্যন্ত গ্রাম শিবনগর এর ক্ষেত্রেও। প্রবাহমান পূণ্যতাই ভৈরব নদীর পূর্ব তীরে আধুনা ডোমকল মহাকুমার শিবনগর গ্রাম ছিল তখন পরিচয় বিহীন এক অখ্যাত প্রত্যন্ত গ্রাম।এখানে না ছিল শিক্ষা দীক্ষা না ছিল এগিয়ে চলার সংস্কৃতি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিবনগর গ্রামের মানুষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন দুজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব -এদের একজন হলেন সাবের আলী বিশ্বাস এবং অন্যজন শফিক মন্ডল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার জোয়ার এসেছিল তার প্রবাহমান ধারা থেকে বাদ যায়নি বাংলার নারী সমাজ শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একজন সুশিক্ষিত নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তিনি হলেন সাবের আলী বিশ্বাসের অর্ধাঙ্গিনী রাজবালা দেবী । সাবের আলী স্বপ্ন দেখেছিল তার গ্রাম শিবনগরে একটি হাই স্কুল বানাবে রাজবালা তার স্বামীর স্বপ্নের উৎস হয়েছিল ,দোসর হয়েছিল ,হয়েছিল যথার্থই সহধর্মিনী । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে যখন গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি ঠিক সেই সময় দাড়িয়ে রাজবালা দেবী বুঝতে পেরেছিল গ্রামে স্কুলের প্রয়োজন কতটা তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টার ফসল আজ শিবনগর হাই স্কুল।

১৯২৭ সাল ছিল শিবনগর গ্রামের শিক্ষা জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় একহাতে মৃত্যুর পরোয়ানা আর অন্য হাতে আলোর প্রদীপ নিয়ে সর্বপ্রকার বাধার বেষ্টনী ভেদ করে ও প্রতিকূলতাকে প্রদানত করে কিছু প্রগতিশীল মানুষের ঐকান্তিক আনুগত্যে দুর্বার গতি নিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৯২৭ সালের এক মহেন্দ্রক্ষণে উদার সমাজসেবী শফিক মন্ডলের প্রদত্ত একখণ্ড জমির উপর সগৌরবে

জুনিয়র হাই মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল সাবের আলী বিশ্বাস। যেখানে বাংলা ,ইংরেজি ,আরবি ,সংস্কৃত, বিজ্ঞান ,ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার চর্চা শুরু হয়েছিল ।পরবর্তী সময়ে সেটা শিবনগর হাইস্কুলে পরিণত হয় কিন্তু মঞ্জুরি পাইনি তখনও। তবে ১৯৫০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বেলডাঙ্গা আব্দুল মোমিন হাই স্কুলের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও ডোমকল ভবতারণ হাইস্কুলের শিক্ষক প্রয়াত আব্দুল বারী বিশ্বাস একাই মেট্রিকুলেশন পাস করেন এটা ছিল একটা গৌরবের বিষয়। ১৯৫০ সালের পর শিবনগর হাইস্কুল প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ।আনুমানিক ১৯৫৩ সালে নতুন উদ্যমে শুরু হয় ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়ার হাই স্কুল ।এসময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন হাজী আফতাব উদ্দিন বিশ্বাস ও তার সহযোগী ছিল সাবের আলী বিশ্বাসের সুযোগ্য পুত্র আব্দুল বারী বিশ্বাস ।তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জুলিয়ার হাই স্কুল এবং ১৯৫৭ সালে শিবনগর হাই স্কুল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এবং তার অগ্রগতির চাকা এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

হাজী আফতাব উদ্দিন বিশ্বাস ও আব্দুল বারী বিশ্বাস এর মতো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালে নবম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে শিবনগর হাই স্কুল এবং পরের বছর ১ /১/ ১৯৬৪ সালে সমস্ত প্রতিকূলতাকে প্রদানত করে দশম শ্রেণীর পূর্ণ সরকারি স্কুলে মর্যাদা লাভ করে শিবনগর হাইস্কুল ।সেদিন সকলের মনে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ১৯৬৫ সালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দশম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করেছিল যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন - মোহাম্মদ ইসরাফিল হক বিশ্বাস, খন্দকার আখতারুল ইসলাম ,গোলাম মোস্তফা ,গোলাম রাব্বানী ,শেখ মনজুর হোসেন ,রোশনারা খাতুন প্রমুখ ।শুধু শিবনগর নয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম মালোপাড়া, স্বরুপপুর ,পদ্মারামপুর থেকে প্রচুর ছাত্র শিবনগর এই স্কুলে পড়াশোনা করত।

১৯৬৪ সালে শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যন্ত অনুমোদন পেয়েছিল ঠিকই তবে শিবনগর হাই স্কুলকে তার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে তথা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর অনুমোদন পেতে সময় লেগেছিল অনেকটা। মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা লাভের জন্য গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে হতো ভগীরথপুর কিংবা স্বরুপপুরের মত গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে । ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা দেখা

দিত । বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল অনেকটাই । অবশেষে তৎকালীন সময়ের স্কুলে প্রধান শিক্ষক শ্রী আনারুল ইসলাম মহাশয় এবং সহশিক্ষকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালের শিবনগর হাই স্কুল একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অনুমোদন পায় এবং সাবের আলীর স্বপ্নের স্কুল পরিপূর্ণতা লাভ করে ।একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর অনুমোদন পেলেও সেই শ্রেণিগুলিতে পাঠদানের জন্য কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকটা দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছিল ।তবে তৎকালীন সময়ে স্কুলে উপস্থিত শিক্ষক -শিক্ষিকা মন্ডলী বর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ,তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণায় সকল প্রতিবন্ধকতা কে দূরে সরিয়ে দিয়ে ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে শিবনগর হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং প্রথম থেকেই প্রথমে শিরোপা তুলে নিয়েছিল শিবনগর হাই স্কুল। পার্শ্ববর্তী দাপুটে ভগীরথপুর হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অধিক নাম্বার পেয়ে শিবনগর হাই স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছিল স্কুলের অন্যতম কৃতি ছাত্র সোহেল রানা মন্ডল আর সেই দিনটা শিবনগর হাই স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষকদের কাছে গর্বের দিন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল সেই দিন। আর সেই আনন্দঘন মুহূর্তের অন্যতম অংশীদার ছিলাম আমিও কারণ সেই বছর উচ্চমাধ্যম পরীক্ষায় শিবনগর হাই স্কুল থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিলাম আমি। এইভাবে ২০১৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুরু স্কুলের নতুন পথচলা আর যার ধারা অব্যাহত থাকবে যুগ যুগ ধরে।

যে সাবের আলী না হলে শিবনগর গ্রামবাসীর কাছে অপরিচিত থেকে যেত রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা। অজানা থেকে যেত বিজ্ঞান, দর্শন ,আধুনিক শিক্ষা সে গ্রামবাসীর কাছে রামমোহনের মতই আবির্ভূত হয়েছিল সাবের আলী বিশ্বাস। সময়ের সাথে সাথে সাবের আলী বিশ্বাসের সেই স্কুল আজ অনেক বছর অতিক্রান্ত করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রায় অজানা হয়ে পড়েছে সাবের আলী বিশ্বাস এবং শফিক মন্ডল সহ স্কুল তৈরির সমস্ত কারিগররা।

HAZI A.K. KHAN COLLEGE
DEPARTMENT OF HISTORY
MEMORY BOOK
SESSION - 2022 -2023
GPS Map Camera
Hariharpara, West Bengal, India
2CV8+C7V, Hariharpara, West Bengal 742166, India
Lat 24.043798°
Long 88.415747°
28/03/23 03:23 PM GMT +05:30
Google